আরব্য রজনী : কথার কথা ও কথা-পরম্পরা

সাইফুল্লা

শাহরিয়ার ও শাহজামান, আরব দেশের প্রবল পরাক্রমশালী দুই শাহজাদা। পিতার মৃত্যুর পর দুই জনে দুই প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করছিল। কিন্তু সহসা হল ভাগ্য বিপর্যয়। প্রাসাদে বাদশা শাহজামানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার বেগম বাড়ির এক চাকরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লো এবং তা গোপন থাকল না। ক্রুদ্ধ শাহজামান রাণী সহ সেই চাকরকে হত্যা করে মনের দুঃখে চলে গেল দাদা শাহরিয়ারের কাছে। কিন্তু এখানেও সেই একই অবস্থা। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে শাহরিয়ার পত্নী মাসুদ নামের এক চাকরের সঙ্গে প্রণয়ক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়েছে। বিষয়টি শাহজামান তার দাদাকে অবগত করলে শাহরিয়ার চূড়ান্ত প্রতিহিংসার পথে পা রাখে। সে শুধু রাণীকে হত্যা করে না; সমগ্র নারীজাতিকে তার ক্রোধের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়। সে ফরমান জারি করে, আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে কুমারী কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে; সে সারারাত ওই মেয়েটির সঙ্গে আনন্দ ফূর্তিতে কাটাবে এবং শেষরাতে তাকে হত্যা করবে; যাতে মেয়েটি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ না পায়। অতঃপর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হতে থাকে রাজাদেশ।

ফল যা হওয়ার তাই হয়। রাজ্য জুড়ে হাহাকার ওঠে। একটা সময়ে সারা রাজ্যে আর একটিও যুবতী কন্যাকে না পেয়ে উজীর তার নিজ কন্যা শাহরাজাদকে সে রাত্রে রাজার শয়ন কক্ষে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়। এতদিনে পুব আকাশে নতুন করে সূর্য ওঠে। উজীরকন্যা অসামান্য চাতুর্যে রক্ষা করে তার নিজের জীবন; রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। রাত তখন শেষের দিকে। মন্ত্রী-কন্যার সঙ্গে রাজার ক্রীড়া কৌতুক ততক্ষণে সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু চূড়ান্ত ঘটনাটা ঘটা বা ঘটানোর অপেক্ষা। মন্ত্রীকন্যা প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে রাজার কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়ে একটা গল্প বলা শুরু করলো। যথাসময়ে রাত শেষ হয়ে গেল কিন্তু গল্প শেষ হল না। শাহরাজাদের গল্প শুনে আপ্লুত রাজা তাকে পরের রাত পর্যন্ত অবকাশ দেয়। এদিকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এমনি করে একের পর এক রাত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গল্প শেষ হয় না। গল্প শুনে মুগ্ধ রাজার আর কিছুতেই গল্প বলা এই যুবতীকে হত্যা করা হয়ে ওঠে না।—বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় আখ্যান আরব্য রজনীর আখ্যানের মূলসূত্র এমনি। গল্প এখানে কূলহীন কিনারহীন; সমুদ্রের মতোই ব্যাপ্ত

এবং অতলান্ত এর পরিসর। একটা গল্পের সূত্র ধরে এসেছে আর একটা গল্প। সে গল্প শেষ হতে না হতে প্রস্তুত হয়েছে অন্য একটি গল্পের পটভূমি। নতুন গল্প প্রস্তুত করেছে আরও অজস্র গল্পের প্রেক্ষাপট। সবমিলিয়ে গল্পের অরণ্যে পথ হারিয়েছে সম্রাট শাহরিয়ার; সেইসঙ্গে পাঠকও।

গল্প বলা ও গল্প শোনা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। সৃষ্টির সেই প্রথম পর্বে মানুষ যখন বাক্‌শক্তি সম্পন্ন ছিল না অর্থাৎ কথা বলতে পারতো না তখন থেকে নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার প্রতি ছিল তার অদম্য আকুলতা। তখন আকারে ইঙ্গিতে কথা চলতো। তারপর একটা সময় বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হওয়া গেল। অতঃপর আর পিছনে ফিরে তাকানোর প্রশ্ন উঠলো না। প্রবাহিত হল গল্পস্রোত। মানুষ ততদিনে রীতিমতো গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাণীতে পরিণত হয়েছে; উপভোগ করছে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের আস্বাদ। প্রভাতে গোষ্ঠীর মানুষ হয়তো নানা দলে বিভক্ত হয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছিল। দিনান্তে আস্তানায় ফিরে এল তারা। সারাদিনে প্রত্যেক দলেরই অভিজ্ঞতার ঝুলি কমবেশি পূর্ণ হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের জানান দেওয়া দরকার। ততক্ষণে হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিতে মুখোমুখি বসে চললো অভিজ্ঞতার বিনিময়। গল্পের জাল সম্প্রসারিত হল। তারপর সময় যত বয়ে চললো সে গল্পজালে লক্ষ করা গেল নানা গিট, নানা মাত্রা।

একটা সময় মানুষের চিন্তা চেনতনার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকতো জীবন ধারণের বিষয়টি। কী করে সুস্থভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যাবে। এর অতিরিক্ত কোনো ভাবনা সেভাবে তাদের আলোড়িত করতো না। পরে অবস্থার পরিবর্তন হল। বিশেষত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় পরিশ্রম করলে অবশিষ্ট দিনগুলোতে সম্পূর্ণ বসে বসে খাওয়া চলে। অখণ্ড অবসর যাপন করা যায় একান্ত ইচ্ছা অনুসারে। এই অখণ্ড অবসরই গল্পকে রঞ্জিত করলো নিত্য নতুন রঙে। যখন খেয়ে পরে সুস্থভাবে জীবনযাপন করা ছিল মূল লক্ষ্য তখন জনজীবনে চর্চিত গল্পসমূহ ছিল একরঙা; ফ্যাকাশে ধরনের। এখন তা জমকালো রূপ নিল। মনের গতি সীমাহীন; দিগন্ত বরাবর তার সতত পা ফেলা। এমন অবস্থায় গল্পের রঙ দিনে দিনে বদলে যেতে থাকলো। গল্পের অঙ্গনে বিশেষ করে জায়গা করে নিল পশুকথা, রূপকথা, রাজা রাজড়ার কাহিনি প্রভৃতি। পৃথিবীময় যেখানে যেখানে মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে তার কোথায়ও তেমন ব্যতিক্রম ঘটলো না। সময়ের বিভিন্নতা নিশ্চয়ই ছিল। সব গল্পকথা সর্বত্র সমসময়ে, সমানভাবে বিকশিত ও রূপান্তরিত হয়নি। এক এক স্থানে এক এক সময়ে হয়েছে এবং সে সবের মধ্যে পারম্পর্য বজায় থেকেছে।

দেশে দেশে প্রচলিত গল্পকথার মধ্যে পারম্পর্য আছে, সাদৃশ্য আছে অব্যশই; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নির্দিষ্ট একটা দেশের বা অঞ্চলের গল্পকথার কোনো নিজস্বতা বা বিশিষ্টতা নেই। আলবৎ আছে। প্রত্যেক অঞ্চলের গল্পকথার আছে

বিশেষ বিশিষ্টতার দিক। আরব্য রজনীও তার ব্যতিক্রম নয়। আরব দেশ অন্য অনেক দেশের থেকে অনেকটাই আলাদা। আলাদা এর প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনাচরণ এবং অবশ্যই জীবনবোধ। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর; কিন্তু এর সবটাই প্রায় মরুভূমি। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে জীবনের পদধ্বনি শোনা যায় সামান্যই। রূক্ষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন স্পন্দিত হতে পারে না তার স্বাভাবিক ছন্দে। খাদ্য খাবারের অভাব আছে, তবে সবচেয়ে বেশি অভাব জলের। জীবনকে এখানে পদে পদে প্রবল সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। এমন অবস্থায় আর পাঁচটা দেশের মানুষের মতো করে ছোটো থেকে বড়ো হতে পারে না আরবের ভূমিপুত্ররা। ধূসর জীবন বাস্তবতা তাদেরকে করে তোলে প্রবল সংগ্রামী ও অনেকাংশে হিংস্র। তাদের নিজেদের ন্যূনতম খাদ্যখাবার নেই। এদিকে তাদের বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হাজারও খাদ্য খাবার ও ধনদৌলতে সমৃদ্ধ এক একটি কাফেলা। এমন অবস্থায় দীর্ঘদিন ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব প্রায়; একঅর্থে নিরর্থকও। তাদের কেবলই মনে হয়, এই বৈপরীত্য ঈশ্বরের প্রবল স্বেচ্ছাচারের অন্য নাম। ঈশ্বরের এই স্বেচ্ছাচারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই রচনা করে নেবে তারা। যেমন ভাবনা তেমন সিদ্ধান্ত। এমন অবস্থায় নিজেদের অবস্থার উন্নতির পক্ষে সহজতম পথ কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী কেড়ে নেওয়া; সামনের পথ দিয়ে নিত্য এগিয়ে চলেছে যেসব কাফেলা প্রয়োজন মতো ওইসব কাফেলা লুঠ করো। এমন লুঠেরা জীবনের বাঁকে বাঁকে জমাট বেঁধে থাকে যেসব রোমাঞ্চ তাই মনকে অনুপ্রাণিত করে অন্য ভাবে। হাজারও রোমাঞ্চকর কাহিনির জাল বোনা হয় সেখানে। এইসব কাহিনি বংশ পরম্পরায় বয়ে চলে লোকমুখে। তৈরি হয় আরব্য রজনীর প্রত্নরূপ। তারপর সময়ের অভিঘাতে তা একসময় তার নিজস্ব ছন্দে স্পন্দিত হয়; জন্ম হয় আরব্য রজনীর।

আরব্য রজনী এমনিতে নামে ও রূপে আরব দেশের ঐতিহ্য বহন করলেও যতদূর জানা যায় এর সূত্রপাত হয়েছিল ইরানে। আঁন্দ্রে মিকুয়েল (জন্ম ১২২৯, ফ্রান্স) এর মতো গবেষকরা অন্তত তেমনটাই মনে করেন। ইরান সেই অর্থে আরব দেশের দেশ নয়। একটা সময় পর্যন্ত আর্য ঐতিহ্যের অনুবর্তনই ইরানীয় সংস্কৃতির মূল কথা ছিল। তখন আরব দেশের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে পারস্যে আসতো এবং এখানকার গল্পকথার সঙ্গে পরিচিত হত। পরে যদিও অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। ইসলামের পতাকাবাহী আরবরা ইরান জয় করলে এদেশে কেবল ইসলামি শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয় না, এখানকার মানুষের দেহ-মনের গভীরে প্রবিষ্ট হয় আরবীয় সংস্কৃতি; মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করে তারা। একটা সময়ের পর এই আত্মীয়তারবোধ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে উভয় পক্ষকে। অর্থাৎ আরব দেশীয়রা এখন আর নিছক বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চায় না তাদের ইরাণীয় ভাইদের সঙ্গে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার প্রতিবেশে অন্য অনেক

কিছুর সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেন চলতে থাকে প্রবল মাত্রায়। ইরাণীয় সংস্কৃতি প্রথমাবধি অতি সমৃদ্ধ। আরবীয়রা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে আরবদেশের কবিদের খ্যাতি ছিল পৃথিবী জোড়া। কিন্তু গল্পকথনে তারা ততটা দক্ষ ছিল না। ইরাণীয় ভাইদের কাছ থেকে তারা এ বিষয়ে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করলো। ইরাণীয় 'আফসানা'-র প্রভাবে তারা প্রভাবিত ছিল প্রথমাবধি; এখন তা সর্বাত্মক রূপ নিল। জাতীয় জীবনে যেসব লোককথা বা গল্পকথা অনেক দিন ধরে প্রচলিত আছে আফসানার অনুসরণে সেগুলিকে নবরূপে নির্মাণ করা হল। এতে এর আবেদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। তারপর ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাতিসত্তা আচ্ছন্ন হল গল্পরসে; তারকা খচিত হল আরব্য রজনীর আকাশ। এক্ষেত্রে এমন একটি মতও প্রচলিত আছে যে, গোটা আরব্য রজনী শুরুতে পারস্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ছিল, পরে তা আরবি ভাষায় অনূদিত হয় এবং আরব ভূখণ্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলা বাহুল্য, অভিমতটি অবিতর্কিত নয় এবং এ নিয়ে শেষকথা বলার মতো অবস্থায় আমরা এই মুহূর্তে নেই। ফারসি ভাষায় লিখিত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত কোনো পাণ্ডুলিপির হদিশ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। যদি আগামী দিনে তেমন কোনো পাণ্ডুলিপির সন্ধান মেলে তবে হয়তো এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা যাবে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত আরব্য রজনীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি আরবি ভাষায় রচিত এবং তা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা।

কল্পনার অতি বিস্তার, প্রবল জীবন কামনা, উদ্দাম রোমান্টিকতা, এসবের সঙ্গে সূক্ষ্ম নীতিবোধের সংযুক্তি প্রস্তুত করেছে আরব্য রজনীর প্রেক্ষাপট। ততদিনে সমগ্র আরব দেশে ইসলামের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সীমাহীন লুঠতরাজ, কারণে অকারণে খুনখারাবি, বীভৎস রক্তপিপাসা এসব বিকৃত জীবনবোধের সংমিশ্রণে সুগঠিত দুর্ধর্ষ জাতি-সংস্কৃতি বাঁধা পড়লো ইসলামি শৃঙ্খলার মধ্যে। এতে চিত্রনাট্যে বদল হল অনেকটাই। জীবনাচরণে এল কিছুটা শৃঙ্খলা; অন্য এক নৈতিকতাবোধে জারিত হল তারা। সচেতন পাঠক লক্ষ করবেন, আরব্য কাহিনির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে এই নৈতিকতার ছাপ। পনেরো রজনীর কাহিনি কথা যেমন। দিকভ্রান্ত হয়ে এক যুবতীর বাণিজ্যতরী উপনীত হয়েছে একটি অজানা দ্বীপে। সেখানে উপনীত হয়ে সে দেখে, এখানে একটি রাজপুরী রয়েছে যে রাজপুরীতে সবই আছে নেই কেবল কোনো জীবিত মানুষ; অদ্ভুতভাবে এখানে সকলে পাথরে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি প্রবলভাবে তাড়িত করে ওই যুবতীকে। সাহসে ভর করে এগিয়ে যায় সে। অতঃপর একটি জীবিত ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়। ছেলেটি বসে বসে কোরাণ শরিফ পড়ছে। এই মৃত্যু পুরিতে সে একা কীভাবে রক্ত মাংসের শরীর সহ বেঁচে আছে! এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে ছেলেটি জানায়, যে সে এই রাজদরবারের রাজপুত্র। তার পিতা মাতা সকলেই ছিল ধর্মবোধ

শূন্য। প্রবল বিরোধিতার মুখে সে একাকী জ্বালিয়ে রেখেছিল ধর্মীয় মূল্যবোধের দীপ। তারপর একদিন ঐশ্বরিক রোষে দগ্ধ হয়ে গেল সমস্তটা। সে ছাড়া পাথরে পরিণত হল এ রাজপুরীর বাকি সব কিছু। ধর্মবোধের কারণেই রক্ষা পেয়েছে সে এবং আজও জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে ধর্মের প্রদীপ; তাই তার এই কোরান পাঠ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামি মূল্যবোধকে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এই গল্প কাহিনিতে। উদাহরণের শেষ নেই। আরব্য রজনীর কলেবর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত। এখানে গল্পের পরতে পরতে যেমন ইসলামি মূল্যবোধের ফল্গুধারা বয়ে গেছে তেমনি এর বহিরঙ্গে রয়েছে ইসলামি ঐতিহ্যের প্রগাঢ় প্রতিবিম্বন। ইসলামি রীতি অনুসারে, যে কোনো শুভ কাজের সূচনা করা হয় আল্লাহতালার প্রশংসা বা গুণকীর্তন করে। আরব্য রজনীতেও এর অনুবর্তন আছে। গল্পের পাত্রপাত্রীরা মাঝেমধ্যেই কোরান তেলওয়াত করেছে। কোনো কোনো কাহিনিতে স্থান পেয়েছে ইসলাম ধর্মের গূঢ় তত্ত্বকথাও—"রমজান মাসে সূর্য্যাস্তের আগে আহার, পান এবং অপবিত্র কথা বলা নিষেধ। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়া না পর্য্যন্ত এইরূপ উপবাস করতে হয়। আরো ভালো হয় যদি এই উপবাসের সময় কোরান ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ পাঠ বা কথা না বলা হয়।" (দুশো চুয়াত্তরতম রজনী)

রূক্ষ জীবন-বাস্তবতার কারণে মরুভূমির মানুষরা একদিকে যেমন হিংস্র স্বভাবের হয় অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতিরই প্রভাবে এদের চরিত্রে সঞ্চারিত হয় অদ্ভুত রকমের কোমলতা। দিনের প্রখর সূর্যালোক যেমন মরুভূমিকে প্রবলভাবে উত্তপ্ত করে রাতের জ্যোৎস্নালোক তেমনি করে সবকিছুকে দ্রুত শীতলতার চাদরে মুড়ে দেয়। হয়তো এরই কারণে মরুবাসীরা একই সঙ্গে নানা বিপরীত বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষের থেকে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া যাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য তারাই আবার পরম শত্রুকে রক্ষা করার জন্য সর্বস্ব পণ করে বসে যদি উক্ত শত্রুটি অতিথির বেশে তার আশ্রয়প্রার্থী হয়। মরুবাসী, বিশেষত আরবীয় মরুবাসীদের আতিথেয়তা জগৎ বিখ্যাত। আরব্য রজনীর কাহিনিতে ফিরে ফিরে এসেছে এই আতিথেতার ইতিবৃত্ত। নয়শো সাতষট্টিতম রজনীর কাহিনিতে দেখা যায়, মারুফ নামের জনৈক পথচারী একজন চাষির বাড়িতে অতিথি হয়েছে। এদিকে ওই চাষির ঘরে অতিথি সেবা করার মতো কিছুই নেই। চাষিটি তখন অন্যের থেকে কর্জ করে অতিথি সেবা করেছে—"চাষী অবাক হয়ে কেঁদে বলে—মাফ করবেন। আমি আপনার যথার্থ সেবা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম। আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। দুটো রুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার ঘরে রুটি ছিল না। অতি কষ্টে পয়সা জোগাড় করে আমি বাজার থেকে রুটি সংগ্রহ করেছিলাম।"

আরব্য রজনীর কাহিনি ধারা অনুসরণ করলে একটি বিষয় সচেতন পাঠক মাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। এখানকার চরিত্ররা যেন এক বিশেষ ধরনের। জটিলতা,

কুটিলতা এসব মানুষের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি। মনের গতি এমনিতেই বিচিত্র; ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে প্রায়শ এই বৈচিত্র্য চূড়ান্ত জটিলতার আবরণে আবৃত হয়। অনেকক্ষেত্রে এমন জটিলতায় আবৃত ব্যক্তি নিজেকে দেখে নিজেই ভীত হয়ে পড়ে; সে তার এক আমির সঙ্গে অন্য আমিকে মেলাতে পারে না। ফলত বিভ্রান্ত হয়; সন্ত্রস্ত হয় হয়তো আরও বেশি করে। আরব্য রজনীর চরিত্রসমূহ আমাদের এই চেনা বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরের মানুষ। জটিলতা, কুটিলতা এসব কিছুর সঙ্গে তাদের কোনো আত্মীয়তা নেই বললেই চলে। তারা নিতান্ত সহজ সরল। প্রকৃতির মতোই। প্রকৃতিতে যেমন হাজারও বৈপরীত্যের সমাহার ঘটে, কিন্তু কোথায়ও কোনো অসামঞ্জস্য দানা বাঁধে না এরাও তেমনি। এরা যখন কাউকে ভালোবাসে তখন সমস্ত সত্তা দিয়ে বাসে; আবার যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয় প্রতিপক্ষকে। আমরা নাগরিক মানুষরা প্রতি মুহূর্তে জল মাপি; মেপে মেপে কথা বলি; রীতিমতো হিসাব কষে ভালোবাসি। আরব্য রজনীর চরিত্ররা এমন করে ভাবতেই পারে না। তারা নিতান্তই সোজা সাপটা; কিছুটা বেপরোয়া।

শাহাজামান যখনই আবিষ্কার করলো তার বেগম অসৎ চরিত্রের তখনই কর্তব্য স্থির করে নিতে সে এতটুকও দ্বিধা করলো না। কালবিলম্ব না করে কুলটা স্ত্রী ও তার প্রণয়ীকে হত্যা করে বিবাগী হল সে। একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকালো না; নিরূপণ করার চেষ্টা করলো না কার্যকারণ সম্পর্ক; সামান্য সময়ের জন্যও দর্পণের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো না নিজেকে। এদিকে একই প্রেক্ষিতে একই মানসিক অবস্থায় শাহজাহানের ভাই শাহরিয়ারের মনের আকাশে সামান্য চিন্তার মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল মাত্র; কিন্তু সে মেঘ দূরীভূত হয়ে তার মনের আকাশে নতুন সূর্য উঠতে কালবিলম্ব হয়নি। এক্ষেত্রে মেঘ সরে গিয়ে এমন এক সূর্য উঠলো যে সূর্যের আলোয় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে গেল রাজ্যের তরুণী সমাজ। কিন্তু কেন? এই সব তরুণীদের কী অপরাধ? কেন রাজার অদ্ভুত ইচ্ছার আগুনে তাদেরকে ওভাবে আত্মাহুতি দিতে হবে? কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। প্রশ্ন করার কথা কারও মনে উঠলোও না সেভাবে। বন্য পরিবেশে বাঘ কর্তৃক হরিণ শিকার করা যেমন নিতান্ত স্বাভাবিক বিষয়, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না এও তেমনি। রাজার ইচ্ছা হয়েছে, তিনি প্রতি রাত্রে একজন রমণীর সঙ্গে রমণ করে অতঃপর তাকে হত্যা করবেন; এর মধ্যে কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা বা অন্যায় আছে বলে মনে করে না রাজাকে আবৃত করে থাকা পারিষদবর্গ।

আমাদের সাধারণ বিচারবোধ প্রসূত কোনো সমীকরণই প্রযুক্ত হয় না এক্ষেত্রে। চূড়ান্ত অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হয় কাহিনির পরবর্তী ঘটনাক্রমও। নারীদের প্রতি সাংঘাতিক বিদ্বেষ বশত যে রাজা তার সঙ্গে সহবাস করা একটি রমণীকেও জীবিত রাখে না পরের দিনের প্রভাত পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র রাজাটাই একটি মেয়ের

গল্পের মোহে এতটাই আবিষ্ট হয়ে পড়ে যে কখন রাত্রি শেষ হয়ে যায় তার হুঁশ থাকে না। শুধু এক রাত নয়, এমনি করে অতিবাহিত হয় কত শত রাত। নারী ঘাতক রাজা এখন গল্পের রাজপুত্র। দুরন্ত সব গল্পস্রোতে নিজেকে সম্পূর্ণ করে ভাসিয়ে দেয় সে। এমন পরিকল্পনা একঅর্থে প্রবল চমকপ্রদ, অন্যঅর্থে নিতান্ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিক গল্পের পাত্রপাত্রীদের নিজস্বতার সাপেক্ষে। যে সহজ সাবলীল জীবনছন্দে স্নাত তারা তার সাপেক্ষে সবই স্বাভাবিক। এখানে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয় সে আমাদের নিজস্ব বিচার বুদ্ধির নিরিখে। আমরা স্বভাবত একটু সন্দিগ্ধ স্বভাবের; আমাদের মন তাই সহজে সব কিছুতে আর্দ্র হয় না। আরব্য রজনীর চরিত্ররা তাদের একান্ত নিজস্বতার গুণে যাবতীয় অসামঞ্জস্যকে দলিত মথিত করে রচনা করতে পারে সত্যের নতুন সমীকরণ। তাই এখানে রক্তপিপাসু রাজার মন অনায়াসে সিক্ত হয় সামান্য গল্প রসে।

একদিক থেকে দেখলে এই যে অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যের সীমায় নামিয়ে আনা কেবল আরব্য রজনীর পাত্রপাত্রীদের একান্ত নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। অধিকাংশ লোকায়ত কাহিনির ধরনই তাই। রূপকথা, পশুকথা এসবের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, ঈশপের গল্প, জাতকের গল্পের মতো লোকায়ত সব কাহিনিতেও ঘটনা ও চরিত্রের রূপায়ণে এর ঘনিষ্ঠ অনুবর্তন লক্ষ করা যায়। এখানে পক্ষীরাজ ঘোড়ারা তো বটেই যন্ত্রচালিত ঘোড়ারাও অনায়াসে আকাশে ওড়ে, রন্ধনশালায় আচ্ছা করে ভাজা হচ্ছে যে মাছকে সে মাছ একলাফে জলে গিয়ে পড়তে পারে, মন্ত্রপাঠ করে এক মুহূর্তে মানুষকে পশুতে পরিণত করে দেওয়া যায়, সামান্য একটি আংটির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে বিরাটাকার এক দৈত্য। শুধু তাই নয়, স্থানে স্থানে আক্ষ্ম কাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসে সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়, মন্ত্রপূত ঝোলা থেকে সতত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে টাকা পয়সা; ধনরত্ন। আজকের পরিভাষায় যাকে আমরা ম্যাজিক রিয়ালিজম বলি তার মূল নিহিত রয়েছে এইসব গল্পের গভীরে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রথমাবধি সীমানাহীন। এদিকে মানুষ মাত্রই সীমাবদ্ধতার বাধনে আবদ্ধ। তার অপ্রাপ্তির সীমানা সতত প্রসারিত হয়। এই অবস্থায় আমরা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাতে নিয়ত কল্পনার জাল বুনে চলি। যে জীবনে অপ্রাপ্তির বহর যত বেশি সে জীবন ততবেশি কল্পনাপ্রবণ হয়। সীমাহীন শূন্যতার গভীর থেকে জন্ম হয় ততোধিক চমকপ্রদ সব কল্পনার। একঅর্থে কল্পনার ডানায় ভর করে দূর আকাশে পাখা মেলা জীবনে বেঁচে থাকার পক্ষে মূলমন্ত্র। আরব্য রজনী বা এই জাতীয় কাহিনিসমূহের জনপ্রিয়তার মূল নিহিত রয়েছে এখানেই।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার নহর দৃশ্যত দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়—অন্ন, বস্ত্র, নিরাপত্তা ও তার অতিরিক্ত বিষয়সমূহ। এক্ষেত্রে ম্যাজিক রিয়ালিজমের বিষয়টি বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় প্রথমত অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও নিরাপত্তা কেন্দ্রিক বিষয়কে ঘিরে।

এখানে তাই বিশেষ বিশেষ গামছা বা পাত্রের মধ্যে থেকে বিশিষ্ট সব মুখোরোচক খাদ্যখাবার বেরিয়ে আসে। তার অতিরিক্ত তেমন কিছুর দেখা মেলে না। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, নিরাপত্তা নিরপেক্ষ যা কিছু কামনার ধন তার নিরসনে মানুষ কেবল ম্যাজিক রিয়ালিজমের নির্দিষ্ট পরিসরে নিজেকে সীমায়িত রাখে না, ছড়িয়ে দিতে চায় আরও দুর দিগন্তে। এতে কাহিনি ধারায় নতুন নতুন রঙ লাগে। পশুকথা, লোককথা, রূপকথা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ভিড় করে আসে। আক্ষ্ম রব্য রজনীও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে পশুকথা বিভিন্ন অনুষঙ্গে তার নিজস্ব ছন্দের দোলায় ভাস্বর হয়েছে। ছেচল্লিশতম রজনীর গল্পে যেমন। এখানে গল্পকথক গল্প শুরু করেছে এই বলে—'শুনুন জাঁহাপানা, আজ একটু অন্য ধরণের গল্প শোনাই।... পশু প্রাণীদের, জীবজন্তুর জাতের কিছু গল্প শুনুন। প্রথমে বলি রাজহাঁস আর ময়ূরীর কাহিনী'। অতঃপর কথিত হয়েছে ময়ূর, রাজহাঁস, ঘোড়া, গাধা, সিংহ, আদমকিন এসব চরিত্র আশ্রিত চমৎকার এক গল্প। এ গল্পে আদমকিন নামের হিংস্র প্রাণীর তাড়নায় রাজহাঁস, গাধা, ঘোড়া সকলেই তাড়িত হয়; তারা পশুরাজ সিংহের কাছে দুরন্ত আদমকিনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য কামনা করে। সিংহ মহাশয় তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হয় আদমকিন বধের লক্ষ্যে। শুরু হয় ধুন্ধুমার লড়াই। উল্লেখ্য, গল্পে বর্ণিত এই আদমকিন এক আজব ধরণের প্রাণী। আরব্য রজনীর বাইরে এর তেমন দেখা মেলে না।

তবে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রতিপন্ন হয়, আরব্য রজনীর গল্পধারায় পশুকথার পরিমাণ সামান্যই। শতকরা হারে এক শতাংশও হবে না। আবার এতটা কম না হলেও রূপকথার পরিমাণও কিন্তু বেশি নয়। এমনিতে দৈত্য, দানো, পরী, রাক্ষস খোককোস এসবের কথা ফিরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন গল্পে। কিন্তু যে অর্থে আমরা বিশেষ করে রূপকথার গল্প বুঝি এখানে তার পদধ্বনি তেমনভাবে নেই বললেই চলে। এখানে লোককথারই একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। আর এসব লোককথার কলেবর তৈরি হয়েছে রাজা-বাদশা, প্রভু-গোলাম বণিক নাবিক প্রভৃতি থেকে শুরু করে চাষা, জেলে, মাঝি, ধোপা নাপিত এর মতো নিতাক্ষ্ম ন্ত সাধারণ মানুষের জীবনকথাকে অবলম্বন করে।—'ধীবর আবদাল্লা গরীব বটে, তবুও মাছ ধরে জীবন কাটাতে তার দুঃখ ছিলো না। দারিদ্য তার মনে হতাশার সৃষ্টি করতে পারেনি। সে সাধারণ পরিশ্রমী লোক। সারাদিন জাল ফেলেও যেদিন মাছ উঠতো না, সেদিন তাকে উপোসী থাকতে হতো।' লক্ষণীয় সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষকে এখানে কেবল গল্পের বিষয় করা হয়নি; ক্রিয়াকলাপে ও চরিত্র মাহাত্ম্যে তাদেরকে মহিমান্বিতও করা হয়েছে। কখনো কখনো রাতারাতি ঘচনাচক্রে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। হত দরিদ্র থেকে প্রবল ধনবাণ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তারা। সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনি যেমন। বলার অপেক্ষা রাখে না, রাজা-বাদশাদের

পাশাপাশি এইসব সাধারণ মানুষরা বিশেষ করে বাড়িয়ে দিয়েছে আরব্য রজনীর গ্রহণযোগ্যতার সীমানা। সাধারণ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণি আলাদা আলাদা করে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আরব্য রজনীর দর্পণে। এতে তারা বিশেষ আত্মীয়তার বন্ধনে বাধা পড়েছে এ কাহিনির সঙ্গে। বংশ পরম্পরায় সম্প্রসারিত হয়েছে এই আত্মীয়তার সীমানা; জনপ্রিয়তার পারদ হয়েছে ক্রমবর্ধমান।

রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ভূত-প্রেত, জেন পরী, রাক্ষস-খোককোস এসবের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ বজায় আছে সেই প্রথম দিন থেকে। দেশ কাল ভেদে এই আকর্ষণে তেমন কোনো তারতম্য লক্ষ করা যায় না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনাবিল ধারায় বয়ে চলে এই আকর্ষণ-স্রোত। আমরা আগেই বলেছি, মানুষ মাত্রই স্বভাবত নানা সীমাবদ্ধতার বাঁধনে আবদ্ধ। এদিকে এই সীমাবদ্ধতার বেড়া ডিঙানোর জন্য তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আর এই দুনির্বার আকাঙ্ক্ষাই তাকে অণুপ্রাণিত করে এমন সব কাহিনি-দেশে মানস ভ্রমণে। ফলত প্রাণিত মন একদিকে যেমন বহমান কাহিনি-স্রোতে স্নাত হয়ে তৃপ্ত হয় অন্যদিকে তেমনি রচনা করে নতুন নতুন সব কাহিনি; কখনো বা প্রচলিত কাহিনি ধারায় কাহিনি সংযোজন করে নতুন করে। এতে তা নিরবচ্ছিন্ন ও চিরবহমান থাকে। আরব্য রজনীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

আজ আমরা আরব্য রজনী বলতে যে আখ্যান কথাকে বুঝি তা অবশ্যই একদিনে একক কোনো জনসমাজের জীবনবৃত্তান্ত পরম্পরায় এই নির্মিতি পায়নি। বহুকাল যাবৎ বহু দেশের বহু মানুষের জীবনকামনা ও জীবনাভিজ্ঞতা বিন্দু বিন্দু রূপে সঞ্চিত হয়ে প্রস্তুত হয়েছে এই বিরাট বারিধি। প্রথম দিকে সহজ সরল একমুখী জনপ্রিয় গল্পকথা রূপেই আরব্য রজনীর বিশেষ প্রচলন ছিল। পরে ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠা পর্বে, বিশেষত আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে এর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। খলিফা হারুন অর রশিদ এর প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায়। আব্বাসীয় শাসনকাল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে সুশাসন ও সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্বাসীয় খলিফারা। তখন জনজীবনে বহমান ছিল এক পরিতৃপ্তির বাতাস। জীবন নিরুপদ্রব; এই অবস্থায় মানুষ বেশি বেশি করে নিমজ্জিত হয়েছিল গল্পের গভীরে; আর তাদের প্রিয় রাজা মহাশয়কে বসিয়েছিল গল্পের কেন্দ্রস্থলে। তাঁকে অভিষিক্ত করেছিল নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা ধারায়—"তাকে বললাম—ভয় নেই। আমার সঙ্গে বাগদাদ চলো। সেখানকার সুলতান মহিমময় হারুণ-অল-রসিদ দয়াবান। আমি তোমায় সাহায্য করবো। তোমার রাজ্য শাপমুক্ত করার চেষ্টা করবো।"

একটা সময় ছিল যখন আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায় সিন্দাবাদ নাবিকের কথা, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, হাতেমতাই এসব কাহিনি সংযুক্ত ছিল না। পরে

পাশাপাশি এইসব সাধারণ মানুষরা বিশেষ করে বাড়িয়ে দিয়েছে আরব্য রজনীর গ্রহণযোগ্যতার সীমানা। সাধারণ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণি আলাদা আলাদা করে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আরব্য রজনীর দর্পণে। এতে তারা বিশেষ আত্মীয়তার বন্ধনে বাধা পড়েছে এ কাহিনির সঙ্গে। বংশ পরম্পরায় সম্প্রসারিত হয়েছে এই আত্মীয়তার সীমানা; জনপ্রিয়তার পারদ হয়েছে ক্রমবর্ধমান।

রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ভূত-প্রেত, জেন পরী, রাক্ষস-খোককোস এসবের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ বজায় আছে সেই প্রথম দিন থেকে। দেশ কাল ভেদে এই আকর্ষণে তেমন কোনো তারতম্য লক্ষ করা যায় না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনাবিল ধারায় বয়ে চলে এই আকর্ষণ-স্রোত। আমরা আগেই বলেছি, মানুষ মাত্রই স্বভাবত নানা সীমাবদ্ধতার বাঁধনে আবদ্ধ। এদিকে এই সীমাবদ্ধতার বেড়া ডিঙানোর জন্য তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আর এই দুনির্বার আকাঙ্ক্ষাই তাকে অণুপ্রাণিত করে এমন সব কাহিনি-দেশে মানস ভ্রমণে। ফলত প্রাণিত মন একদিকে যেমন বহমান কাহিনি-স্রোতে স্নাত হয়ে তৃপ্ত হয় অন্যদিকে তেমনি রচনা করে নতুন নতুন সব কাহিনি; কখনো বা প্রচলিত কাহিনি ধারায় কাহিনি সংযোজন করে নতুন করে। এতে তা নিরবচ্ছিন্ন ও চিরবহমান থাকে। আরব্য রজনীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

আজ আমরা আরব্য রজনী বলতে যে আখ্যান কথাকে বুঝি তা অবশ্যই একদিনে একক কোনো জনসমাজের জীবনবৃত্তান্ত পরম্পরায় এই নির্মিতি পায়নি। বহুকাল যাবৎ বহু দেশের বহু মানুষের জীবনকামনা ও জীবনাভিজ্ঞতা বিন্দু বিন্দু রূপে সঞ্চিত হয়ে প্রস্তুত হয়েছে এই বিরাট বারিধি। প্রথম দিকে সহজ সরল একমুখী জনপ্রিয় গল্পকথা রূপেই আরব্য রজনীর বিশেষ প্রচলন ছিল। পরে ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠা পর্বে, বিশেষত আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে এর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। খলিফা হারুন অর রশিদ এর প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায়। আব্বাসীয় শাসনকাল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে সুশাসন ও সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্বাসীয় খলিফারা। তখন জনজীবনে বহমান ছিল এক পরিতৃপ্তির বাতাস। জীবন নিরুপদ্রব; এই অবস্থায় মানুষ বেশি বেশি করে নিমজ্জিত হয়েছিল গল্পের গভীরে; আর তাদের প্রিয় রাজা মহাশয়কে বসিয়েছিল গল্পের কেন্দ্রস্থলে। তাঁকে অভিষিক্ত করেছিল নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা ধারায়—"তাকে বললাম—ভয় নেই। আমার সঙ্গে বাগদাদ চলো। সেখানকার সুলতান মহিমময় হারুণ-অল-রসিদ দয়াবান। আমি তোমায় সাহায্য করবো। তোমার রাজ্য শাপমুক্ত করার চেষ্টা করবো।"

একটা সময় ছিল যখন আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায় সিন্দাবাদ নাবিকের কথা, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, হাতেমতাই এসব কাহিনি সংযুক্ত ছিল না। পরে

তা ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হয়। যতদূর জানা যায়, লিখিত রূপে আরব্য রজনীর আধারে সিন্দাবাদ বা আলিবাবার কাহিনি প্রথম স্থান করে নেয় ইউরোপীয় নির্মাতাদের হাত ধরে। তারা আরবি বা ফারসি থেকে আরব্য-কাহিনির অনুবাদ করতে বসে ততদিনে জনজীবনে দানা বাধা নতুন নতুন সব কাহিনিকে মূল কাহিনির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। গবেষক ও আরব্য রজনীর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদক আঁতোয়ান গালাদঁ এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে এ বিষয়ে। সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি যেসব গল্প শুনেছিলেন অনুবাদকালে সেগুলিও সংযুক্ত করেছিলেন পাণ্ডুলিপির মূলগল্পের সঙ্গে; এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। পরে এই ধারা সর্বত্র অনুসৃত হয়। বর্তমানে আরব দেশে ও অন্যত্র আরব্য রজনীর যে সম্পূর্ণ লিখিত রূপ প্রচলিত আছে সেখানে রয়েছে সিন্দাবাদ বা আলিবাবার উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। লীলা মজুমদার অনূদিত ও সম্পাদিত ছোটোদের আরব্য রজনীতে উপক্রমণিকা অর্থাৎ শারিয়ার—শাহারাজাদ বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হওয়ার পর মুল গল্প শুরুই হয়েছে সিন্দবাদের কাহিনি দিয়ে—'হারুন-অল-রশিদ যখন বাগদাদের খলিফা ছিলেন, তখন সেখানে সিন্দবাদ নামে একজন গরীব মুটে ছিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত খেটে, কোনো রকমে সে দিন গুজ্‌রান করতো।'...উল্লেখ্য যে, আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায় এই যে সিন্দবাদ বা আলিবাবার অন্তর্ভুক্তি তা কিন্তু মোটেই বেমানান নয়। আরব্য উপাখ্যানের যে মূল সুর তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এইসব কাহিনি। এতে এগুলিকে মূল কাহিনির মধ্যে স্থান করে দিতে কোনো সমস্যা হয়নি। জনমানসেও কাহিনিগুলি গৃহীত হয় অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে। এমনিতে সিন্দবাদ বা আলিবাবার কাহিনি অদ্ভুত রকমের নাটকীয় ও আকর্ষণীয়। এমন আকর্ষণীয় কাহিনির সংযুক্তি আরব্য রজনীর আবেদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সময়ের তুলনামুলক পাঠ নিলে দেখা যায়, আরব্য রজনীর কাহিনিক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে আরব দেশে নবী মুহম্মদ (স.) আর্বিভাবের অনেক আগে থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর আরও অনেক দিন পর্যন্ত। বলা যায়, ইসলামের স্বর্ণযুগ পেরিয়ে অবক্ষয়ের যুগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে এর পরিসর। কোনো কোনো কাহিনিতে রয়েছে চেঙ্গিস খান, তৈমুরলঙ্গদের প্রসঙ্গও। রাজনৈতিক ইসলামের জয়পতাকা ততদিনে অনেকটাই অবনমিত হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আক্ষ্ম রব দেশে নতুন করে ইসলামের উন্মেষ ও তার প্রতিষ্ঠার যে কালপর্ব তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে আরব্য রজনীর কাহিনি। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়েছে। নবী মুহম্মদ (স.) ও তাঁর চার খলিফা অর্থাৎ খলিফায়ে রাশেদিনদের যে সময়কাল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই সময়ের কথা সেভাবে ছায়াপাত করেনি আরবীয়-কাহিনির অঙ্গনে। এমনিতে এখানে ইসলামি অনুষঙ্গের অভাব নেই। বরং ইসলামি ধর্মকথা ও মূল্যবোধের

উচ্চারণে মুখরিত হয়েছে কাহিনিক্রম, তা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু আলাদা করে ইসলামের কথা বলা, ইসলামের ইতিহাসের গৌরবময় সব অধ্যায়কে কাহিনি ধারায় অর্ন্তভুক্ত করার কোনো সচেতন প্রয়াস এখানে লক্ষ্যগোচর নয়। প্রত্যক্ষত, নবী (স.) ও তাঁর সাহাবারা আরব্য রজনীর বিষয় হয়েছে এমনটা আমাদের চোখে পড়েনি।

ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত গৌরবজনক অধ্যায় স্পেন বিজয় ও ইউরোপে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা। এদিকে এই গৌরবময় কাহিনির কোনোরকম প্রতিবিম্বন নেই এখানে। অথচ এটা থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তখন আজকের দিনের মতো বোমারু বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র সহযোগে পারমাণবিক যুদ্ধের চল ছিল না; প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়ে প্রত্যেকে তার বীরত্ব প্রদর্শন করতো। এমন অবস্থায় উত্তেজনাকর নাটকীয় কাহিনির জন্ম হতই। এই সব কাহিনির কমবেশি ছায়াপাত খুবই স্বাভাবিক ছিল আরব্য রজনীর অঙ্গনে। যে কোনো কারণেই হোক এটা হয়নি। এই প্রসঙ্গে আলাদা করে একটা বিষয় নজরে আসে, বৃহত্তর আরব দেশের বাইরে ভৌগোলিক ক্ষেত্রে আরব্য-আখ্যান সেভাবে সম্প্রসারিত হয়নি। মাঝেমধ্যে চীন দেশের কথা এসেছে। আরবীয় ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সূত্রে উপনীত হয়েছে এই দেশে। হতে পারে নিজেদের ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে নিজেদের গল্পধারাকে আবদ্ধ করে রাখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন আরব্য রজনীর রূপকার ও উপভোক্তারা। তাই অনারব দেশ প্রসঙ্গ, সে সব দেশের কাহিনি কথা উৎসাহিত করেনি তাঁদেরকে।

ওয়াকিবহাল মহল অবগত আছেন যে, আরব্য রজনীর সমান্তরালে ঈশপস ফেবলস, জাতকের কাহিনি, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি নানা কাহিনি প্রচলিত ছিল ইউরোপে বা আমাদের এই ভারতবর্ষে। এসব কাহিনির প্রত্যক্ষ কোনো অভিঘাত আরব্য রজনীতে উপলব্ধ নয়। এটা একঅর্থে কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও অন্য অর্থে এতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। লোককাহিনির বৈশিষ্ট্যই তাই। লোকজীবন তাদের একান্ত অভিজ্ঞতার বাইরে পা রাখতে চায় না সেভাবে। অভিজ্ঞতার নিজস্বতাই এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কথা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আক্ষ্ম রব্য আখ্যানে যেমন ইউরোপীয় বা ভারতীয় সব আখ্যানের ছায়াপাত সেভাবে নেই তেমনি ইউরোপীয় বা ভারতীয় আখ্যানে আরব্য রজনীর প্রভাবও তেমনভাবে চোখে পড়ে না। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রের চিত্রণে যেটুকু সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হয়েছে তা আসলে জীবনকামনা ও জীবনাভিজ্ঞতার সাদৃশ্য প্রসূত। দেশে দেশে, কালে কালে মানুষে মানুষে জীবন কামনা বা জীবনাভিজ্ঞতায় কমবেশি সাদৃশ্য থাকেই। এই সাদৃশ্যই এক্ষেত্রে মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আরব্য কাহিনি কথায় ভারতীয় কাহিনি সেভাবে ছায়াপাত না করলেও ভারতীয় জীবন সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আরব্য রজনীর দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে

মাঝেমধ্যে। সাতশো পঁচাত্তর-সাত্তাতরতম রজনীতে কথিত গল্পের কথা এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে রয়েছে ভারতীয় তপোবন এবং তথাকার অসামান্য সৌন্দর্যঘন শান্তিময় জীবনের কথা—'ভারতের উত্তর পশ্চিমে পৌঁছে, সেখানে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে জিজ্ঞেস করবে যে বলতে পার এখানে এমন কোনো উপবন আছে, যেখানে পাখীরা গান গেয়ে ওঠে। গাছের পাতায় সুরের মূর্ছনা শোনা যায় আর ঝর্ণা কলকল তানে বয়ে যায়? সেই মুসাফির পথ বাতলে দেবে।' তপোবনের সন্ধানে আরবীয় জনৈক সাধু পুরুষ ও দেশীয় এক যুবাকে ভারতে আসার জন্য অণুপ্রাণিত করেছে। তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওই যুবক ভারতে এসেছে এবং ভারতের একজন প্রাজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। উক্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ আরবীয় যুবা পুরুষের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে তার শুভাশুভের কথা ভেবে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে—'সেই পথ ভীষণ বিপদসঙ্কুল। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত শিখরে তোমার মতো একজন সুপুরুষ নওজোয়ানের পক্ষে সেখানে যাওয়া কি উচিত হবে। ভীষণ দুর্গম কষ্টকর পথ।' তবে যুবা পুরুষ তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে চিনিয়ে দিয়েছেন তপোবনের পথ—'ওগুলো সেই সব অতৃপ্ত আত্মা, ভূত প্রেতের। তারা তোমায় খুবই ভয় দেখাবে। তুমি সেসব মোটেই গ্রাহ্য করবে না, ভয় পাবে না। ...ভয়কে জয় করে তুমি যখন পর্বত শিখরে উঠবে দেখবে সেখানে বিরাট একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। দেখতে নয়ন নন্দন। সেখানে তুমি দেখবে নানা রকমের পাখী রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, গান গাইছে। তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পার, তারা তোমার কথার উত্তর দেবে। তাদের তুমি জিজ্ঞেস করবে সেই গাছপালা আর ঝর্ণার দেখা কোথায় পাওয়া যাবে। তারা তোমায় নিশানা বাতলে দেবে। এরপর খোদা তোমার সহায়।' তপোবন সম্পর্কে তো বটেই, এমনিতে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে, এখানকার মানুষজন সম্পর্কে গভীর সশ্রদ্ধ উচ্চারণ রয়েছে আরব্য উপাখ্যানে—'তারা বললো—আমরা হিন্দু। কিন্তু বহু বর্ণ আছে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়রা উচ্চ বংশের, সাহসী, বীর যোদ্ধা। তারা অন্যায় করে না। অন্যায় দমন করে। শত্রুর দমন এবং শিষ্টের পালনই তাদের ধর্ম। ব্রাহ্মণেরা পবিত্র, শুভ্র, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকে। তারা সংগীতচর্চা করে। তারা সহজ, সরল। আরো বাহাত্তর বর্ণের লোক আছে। তারা নিম্ন বর্ণের।' এই উচ্চারণ অন্য এক আলোকিত ভুবনের সন্ধান দেয়। প্রতিপন্ন হয়, দুই দেশের আত্মীয়তা ও চেনাজানা বহু দিনের, বহু কালের; এ আত্মীয়তার পরতে পরতে মিশে আছে অনন্য মধুরতা। প্রসঙ্গত আরও স্মরণীয় যে, এমনিতে আরব্য কাহিনির মূল ইরাণীয় 'আফসানা'-র মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করা হলেও কোনো কোনো গবেষক এও মনে করেন যে, ইরাণীয় এই আসফানারও মূলে থাকতে পারে কোনো ভারতীয় কাহিনি। আমরা জানি, ইতিহাসের এক অধ্যায়ে ভারতবর্ষ ও ইরান দেশের

মধ্যে বহমান ছিল ব্যাপ্ত ও গভীর সাংস্কৃতিক স্রোত। সেই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের সাপেক্ষে এমন অনুমান নিতান্ত অসংগত বলে নাও মনে হতে পারে।

আরব্য রজনীর কাহিনি ধারায় এমনিতে ইসলামি রীতি ও ঐতিহ্যের অনুবর্তন থাকলেও একটি বিষয় এক্ষেত্রে বিশেষ করে লক্ষ করার মতো। মেয়েদের চরিত্রচিত্রণে ইসলামি মুল্যবোধের উচ্চারণ সবসময় তেমন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। মেয়েরা এখানে অনেক বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও স্বাধীনচেতা; তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে এক্ষেত্রে শাহরাজাদের কথা বললেই যথেষ্ট হবে। অমন ভয়ঙ্কর দুর্বিপাকের মধ্যে দাঁড়িয়েও সে এতটুকুও বিচলিত হয়নি। শেষদিন পর্যন্ত নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছে এবং স্পর্শ করেছে লক্ষ্য মাত্রা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে মেয়েরা বিবাহাদি করার জন্য অনেকক্ষেত্রে তাদের পরিবারের পুরুষ সদ্যস্যদের সম্মতির ধার ধারেনি। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এ যেন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা সুলভ; তবে মাতৃতান্ত্রিকতা যে নয় তা বলা বহুল্য। আরবা রজনীতে মেয়েদের এই যে ব্যক্তিত্বের ঝলক তা কিন্তু একটা জিজ্ঞাসাকে বেশ উসকে দেয়। তাহলে কি আক্ষ্ম রব্য রজনীর রূপকাররা মেয়েদের সামাজিক অবস্থান নিরূপণ করতে গিয়ে ইসলামি মূল্যবোধকে কলা দেখিয়েছেন। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, আরব্য রজনীতে চিত্রিত এইসব সপ্রতিভ নারী চরিত্রের সঙ্গে ইসলামের মুলগত কোনো বিরোধ নেই। বরং নারীকে এভাবে সপ্রতিভ করে প্রতিপন্ন করাই ইসলামের আদর্শ। বস্তুত আজ আমাদের দেশে তো বটেই, ওদেশেও ইসলাম ও মেয়েদের সাামজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে যে সমীকরণ প্রণয়ন করা হয়েছে তা ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী। মা খাজিদা, মা আয়েষা প্রমুখের দৃষ্টান্ত অন্তত তাই প্রতিপন্ন করে। প্রথম জন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে বিরাট ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, অন্যজন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে উটে চড়ে যুদ্ধ করেছেন। আরব্য রজনীর নারী চরিত্ররা তাঁদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে ঘনিষ্ঠভাবে। কোনো কোনো কাহিনিতে এমনও দেখা গেছে, মেয়েরা তাদের স্বামীদের রীতিমতো মারধোর করছে; বেচারী স্বামী অসহায়ভাবে সহ্য করছে তার অত্যাচার। নয়শো ষাটতম রজনীর কাহিনি যেমন—'ফতিমা যে হাত দিয়ে মারুফের মুখে ঘুসি মারছিল, আত্মরক্ষার তাগিদে মারুফ সেই হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল। ফলে একটা আঙুল ভেঙে যায়। কিন্তু মারুফের মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছিল। তার একটা দাঁত ভেঙে গেছে, আর একটা দাঁত নড়ে গেছে।' শোনা যায়, মিশরীয় মেয়েরা নাকি তাদের স্বামীদের উপর আজও চড়াও হয়। হতে পারে সেদিনও তারা এমনি করতো এবং তারই ছায়াপাত ঘটেছে আরব্য রজনীতে।

একটা বিষয় আরব্য রজনীর তাত্ত্বিক পাঠকদের মনে বিশেষভাবে ছায়াপাত

করতে পারে। বিরাট এই কাহিনি ধারায় প্রকৃতির পদধ্বনি সেভাবে কোথায়ও পরিস্ফুট হয়নি। ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণের সূত্রে স্থানে স্থানে প্রকৃতি কাহিনির অঙ্গনে সামান্য ছায়াপাত করেছে মাত্র। 'ভোরের পাখী জেগে উঠল। শাহারজাদ চুপ করে গেল।', 'সামনে শান্ত সমুদ্র, শান্ত ঢেউ, কিন্তু অশান্ত বাসিমের মন। মাথার উপর উজ্জ্বল আকাশ, কিন্তু অন্ধকার বাসিমের হৃদয়।' প্রকৃতির এমন ছেঁড়া ছেঁড়া চিত্রের একটু একটু প্রতিবিম্বন আছে এখানে। বিষয়টা এমনিতে খুব অস্বাভাবিক নয়। কাহিনির ঘনঘটা যে রচনার মুখ্য বিষয়, যেখানে মনের চলমানতা তেমন নেই, সেখানে প্রকৃতির যাতায়াত অবাধ না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এমন বিচিত্র বিষয় ও চরিত্র আশ্রিত আখ্যান ভাগে প্রকৃতির পদধ্বনি আর একটু স্বতঃস্ফূর্ত হতেই পারতো। বিশেষত আরব্য রজনীর কাহিনি-সূত্র যে ভৌগোলিক অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছে তথায় প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈচিত্র্য এত বেশি। এই বিরাট কাহিনির স্থানে স্থানে চরিত্রকে আর একটু বেশি উজ্জ্বল করে অঙ্কন করা যেতেই পারতো এবং সেই সূত্রে তৈরি হতে পারতো প্রকৃতির জন্য সহজ চলমানতার পথ। অবশ্য এক্ষেত্রে আরব্য রজনীর রূপকারদের অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করতে হলে এই ধরনের অপরাপর রচনা যেমন জাতকের কাহিনি, ইশপস ফেলবস, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতির সঙ্গে এর তুলনামূলক পাঠ নিতে হবে। অনিবার্য কারণে সেই পাঠ নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই এ বিষয়ে অধিক কথা বলার সুযোগ এখানে নেই।

আরব্য রজনী ক্লাসিকধর্মী সাহিত্য। ক্লাসিক সাহিত্য মাত্রের সাধারণধর্ম ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্রের রূপায়ণে নিরপেক্ষতা বা অবজেকটিভিটি বজায় রাখা। সেদিক থেকে এর ক্লাসিক গুণ বজায় আছে যথেষ্ট মাত্রায়। নানা ধারায়, উপধারায় বিন্যস্ত কাহিনিক্রমে ভীড় করে এসেছে ভালো মন্দ প্রভৃতি হাজারও চরিত্র। এইসব চরিত্রের মধ্যে কেউ অতি ভালো, কেউ অতি মন্দ। ভালো মন্দ, যাই হোক না কেন কারও প্রতিই রূপকারদের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই;তারা সকলেই স্রষ্টার সহানুভূতির আলোয় আলোকিত হয়েছে। এখানে ঘটনা এগিয়ে গেছে তার নিজস্ব ছন্দে; চরিত্র বিকশিত হয়েছে স্বকীয় স্বভাবে। এতে বিশেষ চমৎকারিত্ব তৈরি হয়েছে। এমন নৈর্ব্যক্তিকতা জাতকের কাহিনি বা ইশপস ফেবলসে নেই। সেখানে সাদা ও কালোর পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট। এখানে ঘটনার প্রথম ধাপে পা রেখে বুঝে নেওয়া যায় এর পরিণতি কি হবে। আরব্য রজনীতে অবশ্যই এমন সহজ সমীকরণ করার সুযোগ নেই। কাহিনি এখানে যখন তখন সম্ভাব্য যে কোনো দিকে বাঁক নিয়েছে। তবে এক এক স্থানে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি এমন নয়। বিশেষত ধর্ম সম্প্রদায়গত বিষয়টি যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আরব দেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে তথাকার খ্রিস্টান, বিশেষ করে ইহুদিদের আজন্ম শত্রুতা বর্তমান। এমন অবস্থায় যেখানে খ্রিস্টান বা

ইহুদি সম্প্রদায়ের কথা এসেছে সেখানে নিরপেক্ষতার বিষয়টি প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছে। মুসলমান সমাজ আশ্রিত কাহিনিকারদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহানুভূতির আবরণে ঘটনা ও চরিত্রকে আবৃত করা। ছয়শো একষট্টিতম রজনীতে কথিত কাহিনির অংশ বিশেষ—'জনাব, এ একটি বর্বর ইহুদী। আমাকে বাপের বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিন আমার উপর পশুর মতো আচরণ করে। নানারকম কুৎসিত কাজ করতে থাকে। আমি রাজি না হলে আমাকে চাবুক মারে।' আরব্য উপাখ্যানের কাহিনিসমূহ এমনিতে মানুষের জিঘাংসার পরম প্রকাশ হলেও এখানে খুন খারাবি, রক্তারক্তি এসব দৃশ্য কিন্তু বেশি নেই। চূড়ান্ত মুহূর্তে বারেবারে ঘটনার রাশ টেনে ধরা হয়েছে; এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে প্রাণহানির মতো বিষয়ের বর্ণনা। যে কিছু কিছু জায়গায় এর ব্যতিক্রম আছে সেখানে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। ছয়শো চুরানব্বইতম রজনীর কাহিনিতে দেখা যায়, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এক সম্রাট প্রবল প্রতিহিংসা বশত একশত মুসলমানের প্রাণদণ্ড কার্যকর করেছে—"নির্দিষ্ট সময়ে সম্রাট আদেশ দিলেন। একে একে বন্দী কোতল হতে থাকল। তাদের উপচে পড়া রক্তে গামলা ভর্তি হয়। একশোজনের বলি পর্ব শেষ হয়। গামলা পরিপূর্ণ। বাকী রইল নূর। একশো একতম বন্দী সে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।'

আরব্য রজনীর মুল নিহিত রয়েছে ইরাণীয় আফসানার গভীরে। এই প্রতীতির সাপেক্ষে একটি জিজ্ঞাসা অবশ্যই প্রশ্রয় পেতে পারে। আফসানার সঙ্গে বিশুদ্ধ আক্ষ্ম রবীয় কাহিনির মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি। আরব দেশের মানুষদের সাহিত্যবোধ বরাবর বেশ উন্নত। আরবীয় কবিতার অসামান্যতা বিশ্বজনীন স্বীকৃত সত্য। অসামান্য কবিতার রূপকার আরবরা কীভাবে অনন্য সুন্দর গল্পকথক হয়ে উঠলো। এই কথনকথার প্রথম পর্বে আরব্য রজনীর রূপ ঠিক কী ছিল! বলা বহুল্য, এমন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যায়; লোকায়ত সাহিত্যের বেলায় তো তা রীতিমতো গুরুতর রূপ নেয়। লোকমুখে একটি কাহিনি কখন কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার যথাযথ হদিস দেওয়া একেবারেই সহজ কাজ নয়; হয়তো বা অসম্ভব প্রায়। এমন অবস্থায় সমস্যার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যেতে পারে মাত্র। এবং এই সিঁড়ি ভাঙার ক্ষেত্রেও বিশেষ রূপে অবলম্বন করতে হয় লিখিত রূপকেই। এখনও পর্যন্ত আরব্য রজনীর যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে তা খ্রিস্টিয় অষ্টম নবম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। প্রাপ্ত এই নিদর্শনটি নিছকই নিদর্শন মাত্র। এখানে রয়েছে কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা। এতে ধরা নেই নির্দিষ্ট কোনো কাহিনি। বিচ্ছিন্ন এই নিদর্শন ব্যতিরেকে প্রাপ্ত অপরাপর পাণ্ডুলিপির সবই অনেক পরবর্তীকালের এবং সেখানে আরব্য আখ্যানের বর্তমান রূপটি কমবেশি অপরিবর্তিত রূপে বিধৃত রয়েছে। এইসব পাণ্ডুলিপি

বিশ্লেষণ করে আরব্য আখ্যানের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আরও কোনো নির্ভরযোগ্য পুথি যদি আগামী দিনে পাওয়া যায় তবেই হয়তো এ বিষয়ে প্রামাণ্য কথা বলা যাবে। উল্লেখ্য, আরব্য রজনী সম্পর্কিত যেসব নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দশম শতকের আরবি কবি আল মাসুমির একটি রচনায় আরব্য রজনীর কথা উল্লেখিত হওয়া এবং ইবনে ইসহাক আল নাদিম (মৃত্যু ৯৯৫) এর 'কিতাব আল ফিহরিস্ত' গ্রন্থে আরব্য রজনীর প্রস্তাবনা অংশ বা গল্প কাঠামোর বর্ণনা।

একটা সময় ছিল যখন আরব্য কাহিনির প্রচার প্রসার আরব দেশের মধ্যেই সীমায়িত ছিল। ব্যবসার সুত্রে যেসব বণিকরা ওদেশে যাতায়াত করতো তারা তাদের স্মৃতির ডানায় ভর করে কিছু কিছু কাহিনি বহন করে আনতো ও সেইসূত্রে অনারব ওই সব দেশে আরব্য রজনীর ছেঁড়া ছেঁড়া কাহিনি প্রচলিত থাকতো। পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তার সূত্রপাত হয় ফান্স দেশ থেকে। ততদিনে স্পেন, ফ্রান্স এসব দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে আরবদেশীয়দের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা একসময় আরব্য রজনীর সন্ধানে পা রাখে আরবের মাত্রাটিতে। যতদুর জানা যায়, এক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি সহজে। ফরাসি দেশীয় গবেষক আঁতোয়ান গালাদঁ দীর্ঘ পরিশ্রম করেও এর কোনো লিখিত রূপের সন্ধান পাননি। পরে তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসলে সহসা তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। আরবদেশে ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল সিরিয়ার আলেপ্পো দেশীয় এমন একজন ব্যক্তির যিনি চতুর্দশ শতকে অনুলিখিত আরব্য রজনীর একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন বন্ধুর উদ্দেশে। সেই থেকে শুরু। গলাদঁ কালবিলম্ব না করে পাণ্ডুলিপিটির ফরাসি অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর অনূদিত আরব্য রজনী ১৭০৪ থেকে ১৭১৬ সালের মধ্যে বারো খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় ভাষায় আরব্য রজনীর অনুবাদে জোয়ার আসে। ফরাসি থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে স্পেনিশ, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় অনুবাদ চলতেই থাকে। ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত এইসব আরব্য রজনীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস এন্টারটেইনমেন্ট (ই ডাবলু লেন, ১৮৩৮-৪১), দ্য বুক অব দ্য থাউজেন্ড নাইটস এন্ড ওয়ান নাইট (জন পেইন, ১৮৮২-৮৪), দ্য বুক অব থাউজেন্ড এন্ড এ নাইট (রিচার্ড বার্টন, ১৮৮৫-৮৮)। গুস্তাফ ভেল এর জার্মান ভাষায় অনুবাদের কথা (১৮৩৯-৪২)-ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইউরোপীয় ভাষায় আরবীয় উপাখ্যান এর অনুবাদ ধারা স্তিমিত হয়নি আজও। এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে অদ্যাবধি। ২০০৫ সালে জামাল এডিন বেন ও আন্দ্রে মিকুয়েল তাঁদের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন; ম্যালকম ও উরশুলা লিয়নস এর ইংরেজি ভাষান্তর ছাপা হয়েছে ২০০৮ সালে।

অনুবাদ গ্রন্থের আকার ও আয়তনে বিভিন্নতা তৈরি হয় অবস্থার প্রেক্ষিতে। এমনিতে আরব্য রজনী সুবৃহৎ গ্রন্থ। এর সবটা একসঙ্গে অনুবাদ করা সহজ নয়; সহজ নয় এই বিরাট অনুবাদ গ্রন্থকে একসঙ্গে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তার থেকে বরং অনেক সহজ এর অংশ বিশেষ বা অতি আক্ষ্ম কর্ষণীয় অংশগুলোর অনুবাদের ভার হাতে নেওয়া। ছোটো ছোটো বই আকারে তা প্রকাশ করা, যা ছোটোদের পক্ষে পড়া ও বহন করা সহজ। এদিকে বড়োদের জ্ঞান পিপাসা নিরসনের জন্য সম্পূর্ণ রচনারও বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। এই অবস্থায় ছোটো,বড়ো, মাঝারি সম্ভাব্য সব ধরনের অনুদিত আরব্য রজনী ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে। আজকের পৃথিবীতে মূল ধারার এমন ভাষা প্রায় নেই যে ভাষায় আরব্য রজনী অনুদিত হয়নি। প্রায় প্রত্যেক জনসমাজ এর রসাস্বাদ করেছে এবং আমরা বাঙালিরাও এ ব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে থাকিনি। বড়ো, মাঝারি, ছোটো, অতি ছোটো ইত্যাদি নানা মাপের, নানা ধরনের আরব্য রজনীর প্রচলন রয়েছে আমাদের দেশে। কোনো কেনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে একটি বা দুটি গল্পকে রঙিন কাগজে অতি সুন্দরভাবে ছেপে প্রস্তুত করা হয়েছে এক একটি ছোটোদের আরব্য রজনী।

বাংলায় কে কবে প্রথম আরব্য রজনী অনুবাদ করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ওইসব কথার মধ্যে নিম্নোক্ত কথাটি তুলনায় প্রামাণ্য বলে মনে হয়—'এই গ্রন্থের বাঙ্গলানুবাদেরও অপ্রতুল নাই। সর্ব্বপ্রথম নীলমণি বসাক ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া তাহা বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করেন। তিনি সেই ইংরাজী অনুবাদেরও অনেকাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন। পরে দুর্গাচরণ গুপ্ত ইহা অনুবাদিত করিয়া বহু খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, তারপর বেণীমাধব ভট্টাচার্যেরও একখানি অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছে। সবশেষে কেদারনাথ বসু এম. এ অতি সংক্ষেপে অন্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত বঙ্গানুবাদ আছে তাহা হয় সংক্ষিপ্ত, নয় অসম্পূর্ণ কিংবা মূল্য অধিক বলিয়া সাধারণের সুবিধার যোগ্য নয়, সেই সকল অসুবিধা পরিহারের নিমিত্ত আমি এই অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।" (জগদীশ তর্কালঙ্কার, ভূমিকা—আরব্য উপন্যাস)। তবে এই কথার সাপেক্ষেও কিছু প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করার আগে আরবি বা ফারসির থেকে এই কাহিনির কোনো অনুবাদ হয়নি, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। বিশেষত প্রাগাধুনিক যুগে আরবি বা ফারসি গ্রন্থ অনুসরণে বাংলায় কাব্য কবিতা রচনা করার যেখানে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। হতে পারে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরব্য-আখ্যান অনুসারে কোনো কোনো কাব্য রচনা করা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেসব রচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া পুথিসাহিত্যের যুগে তো আরব্য রজনীর ব্যাপক চর্চা হয়েছে। রৌশন আলি, শায়েদ আলি, হাবিবুর হোসেন,

আজিউদ্দিন আহমেদ এর মতো বেশ কয়েকজন লেখকের নাম পাওয়া যাচ্ছে, (সুত্র মুসলিম ট্রাডিশন ইন বেঙ্গলি লিটারেচার, সৈয়দ আলি আশরফ, পৃ-১৫, করাচি) যাঁরা আরবি বা ফারসি থেকে আরব্য উপাখ্যানের বাংলা রূপ প্রণয়ন করেছিলেন। এমনও হয়েছে, নামে আরব্য রজনী না হলেও আরব্য রজনীর কাহিনি কেন্দ্রিক রচনা অন্য নামে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে আফসোসনামা শীর্ষক একটি বই এর উল্লেখ রয়েছে এবং বইটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আরব্য রজনীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। অনুসন্ধান করলে এমন আরও অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত আরও স্মরণীয় যে, ১৮৫১-৫২ সন নাগাদ মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ নামের জনৈক লেখক, আরবীয়ো উপখ্যান নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন গ্রন্থটি ছাত্রপাঠ্য রচনা হিসাবে বিবেচনা করার জন্য। ১৮৫২-৫৩ সনের সংবাদভাস্কর পত্রিকা এর সাক্ষ্য বহন করছে। এইসব বিবিধ রচনার মধ্যে কোনটি প্রথমে রচিত ও তারপর ক্রমান্বয়ে কোন কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য যে তথ্য প্রমাণের সহায়তা দরকার তা এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। তাই জোর দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সে যাই হোক, বর্তমানে এপার বাংলা ও ওপার বাংলা মিলিয়ে বেশ কয়েকটি সম্পূর্ণ অনুবাদিত আরব্য রজনীর প্রচলন রয়েছে। এগুলির মধ্যে কলকাতা অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ডাবল ক্রাউন সাইজের তেরশত বাহান্ন পৃষ্ঠা সমন্বিত সুবিশাল 'সচিত্র সহস্র এক কিশোর আরব্য রজনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ রচনার পাতায় পাতায় রয়েছে আকর্ষণীয় সব ছবি। কোনো কোনো ছবি রীতিমতো রঙিন এবং প্রবল চিত্তাকর্ষক। বইটির অনুবাদক শ্রীউত্তম ঘোষ। শ্রীউত্তম ঘোষ অনূদিত 'সচিত্র সহস্র এক কিশোর আরব্য রজনী'-র বিশেষ গুণপনার দিক এর ভাষারীতি। ভাষা এখানে এতটাই প্রাঞ্জল যে আলাদা করে স্মরণ না করিয়ে দিলে মনেই হয় না যে এটি অনুবাদের অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা কোথায় কতটা মূলের অনুসারী হবে এবং কোথায় কতটাই-বা নিজস্ব ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখা হবে সে সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে হয় অনুবাদককে। আরব্য রজনীতে এমন কিছু শব্দ বা শব্দবন্ধ আছে যা একান্তভাবে আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনুবাদক সংগতভাবেই এইসব শব্দবন্ধকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আবার এমন কিছু কিছু শব্দ থাকে দেশ কাল ভেদে যার রঙ বদল হয়। নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ওইসব শব্দকে নতুন নতুন সাজে সাজিয়ে নিতে হয়। এক্ষেত্রে এই সাজিয়ে নেওয়ার কাজটি নিপুণ হাতে সম্পন্ন করেছেন অনুবাদক। স্থানে স্থানে অনুবাদক এতটাই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে কাহিনির পাঠ নিতে নিতে যেন মনে হয় অনুপম কোনো চিত্রকাব্যের রস আস্বাদ করা হচ্ছে—'জ্যোৎস্নায় ভেসে

যাচ্ছে চারদিক। দূরে অরণ্যের মাথায় চাঁদের আলো পড়েছে। একটু দূরে একটা সরোবর। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এখন গভীর রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূর থেকে রাত জাগা পাখির ডাক ভেসে আসছে'। এমন অসামান্য অনুবাদের জন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে অনুবাদকের প্রতি।

ভিন দেশের কোনো কাহিনি, তা যতই আকর্ষণীয় হোক, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে যদি তার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের মিশেল না দেওয়া যায় তবে তা বাইরের বিষয় হয়েই থেকে যায়, অন্তরের সামগ্রী হয়ে ওঠে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আরব্য রজনীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। বাংলায় যাঁরাই আরব্য উপাখ্যান নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই আলাদা করে নজর দিয়েছেন দেশীয় ঐতিহ্যের রূপায়ণে। 'সচিত্র সহস্র এক কিশোর আরব্য রজনী'-র রূপকারের মুন্সিয়ানা এখানে প্রশ্নাতীত। ভিন দেশীয় কাহিনির মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের মিশেল দিতে হবে, আবার লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয়টা যেন অতিরিক্ত হয়ে না যায়। তাতে মূলের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অনুবাদক এই উভয় দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। বাংলায় এমনিতে মাংস শব্দটি এখন বহুল প্রচলিত; এমনকি বাঙালি মুসলমান সমাজেও। এদিকে তিনি এই বহুল প্রচলিত শব্দের হাতছানি উপেক্ষা করেছেন। এখানে মাংসের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে গোস্ত শব্দ। গোস্ত কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সূত্রে যে একটা ভাবপরিবেশ তৈরি হয়, প্রতিবিম্বিত হয় ভোজন রসিক মুসলমান সমাজের মানসিকতার দিকটি, মাংস শব্দের সূত্রে অবশ্যই তা হয় না। তাই সঙ্গতভাবেই গোস্ত-র প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। এদিকে এই পক্ষপাতিত্বের বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আরব দেশে খেজুর গাছের প্রাধান্য বর্তমান। কিন্তু আমাদের এই দেশে খেজুর গাছ তেমন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয়। অনুবাদক তাই আক্ষ্ম মদানি করেছেন নারিকেল গাছের অনুষঙ্গ—'ঘানিম নারকেল গাছ থেকে নেমে হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে বাক্সটা ওপরে কষ্ট করে তুললো।' আরব দেশে হলুদ গিরিমাটি, হরিতাল এসবের ব্যবহার থাকার কথা নয়। এদিকে অনুবাদক অবলীলায় এসব বিষয়কে জায়গা করে দিয়েছেন গল্পের অঙ্গনে—'তুই কি জানিস হলুদ গিরিমাটির আর হরিতালের রঙ হলুদ। এ দুটো মিশিয়ে বিষ তৈরি করা হয়। সে বিষ পুড়িয়ে দেয়, লোম উঠে যায়। ঘাস শুকিয়ে যখন হলুদ হয়ে যায়, সেটা গরুরও অরুচি।' চারশো তিয়াত্তরতম রজনীর গল্পে দেখা যায়, মুর তার প্রিয় যদুরকে যেসব খাবার খাওয়ানোর প্রলোভন দেখাচ্ছে তথায় তন্দুরি, মুরগি, বিলাতি বিরিয়ানি এসবের পাশাপাশি রয়েছে 'ধনেপাতা আর শালুক ডাঁটা দিয়ে ফুলের চচ্চড়ি, ভেড়ার মগজের কালিয়া, আঙুরপতার বড়া এবং পিঠে পায়েস ইত্যাদি'। বলা যায়, দেশীয় ঐতিহ্যের এই নিবিড় নির্মাণ বাঙালি মনে আরব্য রজনীর আবেদনকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।

বাংলায়, বৃহত্তর অর্থে প্রাচ্যদেশে যারা আরব্য রজনীর অনুবাদ করেছেন তাদের এই কৃতির মূলে মূলত রয়েছে এর গল্পরস, অংশত অবশ্যই সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার প্রতি আনুগত্য। এক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশীয় এই অবস্থানের সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশীয়দের অবস্থানে কমবেশি বিভিন্নতা আছে। প্রাচ্যদেশীয়দের মতো পাশ্চাত্যদেশীয়রাও এর গল্পরসে মুগ্ধ হয়েছেন ঠিকই; তবে ওই মুগ্ধতা তাদের ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য হয়ে থাকেনি। গাল্পিক মুগ্ধতার আবেশ ঝেড়ে ফেলে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে একে ঘিরে অন্যসব খেলাও খেলতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় ভাষায়, বিশেষত ইংরেজিতে আরব্য রজনীর যে সব অনুবাদ হয়েছে তার পারম্পর্য বিচার করলে প্রতীয়মান হয়, ইংরেজ জাতিসত্তা আরব্য রজনীর শরীরে আরও কোনো রং লাগাতে চেয়েছেন। ইংল্যান্ডে তখন ভিক্টোরীয় যুগ চলছিল। এলিজাবেথীয় যুগের উদ্দাম কামনা বাসনার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিপরীতে ভিক্টোরীয় যুগ ছিল সংযম ও শ্লীলতার বিশেষ দৃষ্টান্ত। তখন যুগপরিবেশের প্রভাবে জাতীয়জীবনে সামগ্রিক এক শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের অনুবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষের মনের গভীরে একটা বিপরীত স্রোত প্রবলভাবে বহমান ছিল। এক্ষেত্রে কামনার এই বহ্নিধারার মূলে বিশেষ করে জলসেচন করার চেষ্টা করা হয়েছিল আরব্য রজনীর সূত্রে। আরব্য রজনীর গল্পবৃত্তে যে উদ্দাম জীবনকামনা স্পন্দিত হয়েছে তা আলোড়িত করে সেদিনের ইংরেজ মনকে; তারা এর তাড়নায় আলাদা করে তাড়িত হয়। যথাসম্ভব উপভোগ করার চেষ্টা করে এই তাড়নাকে। আবার ভিতরের এমন ভালোলাগাকে গোপন করার জন্য তাদের ক্রিয়াশীলতারও শেষ ছিল না। ইংরেজি আরব্য কাহিনির স্থানে স্থানে এমন কথাও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, যে এসব কাহিনি নিছক মানুষের বিকৃত জীবনবোধের ফসল। ইউরোপীয় জনগণ এমন জীবনবোধের সীমানা পেরিয়ে এসেছে অনেক কাল আগে। এখন আর এমন কাহিনিকে ঠিক ভদ্র জীবনবোধের পরিচায়ক বলা যায় না। প্রাচ্যদেশের লোকেরা এখনও সেই অর্থে ভদ্র বা মার্জিত রুচির হয়ে উঠতে পারেনি, তাই তাদের মধ্যে এসবের প্রচলন রয়েছে প্রভূত মাত্রায়। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ সমালোচকের বীক্ষণ এইরকম—'আরব্য রজনীর গল্পগুলি কল্পনাশক্তির সৃষ্টি। কিন্তু এই কাল্পনিক গল্পগুলি পাঠ করে পশ্চিমী পাঠকদের ধারণা হয় যে বাস্তবের প্রাচ্যও বুঝি এইরকম রহস্যময়—দৈত্য-দানব, জীন-পরী, লাস্যময়ী সহজলভ্য নারী ও কামাসক্ত পুরুষ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস এবং আচরণ আর অতি প্রাকৃতিক ঘটনার দেশ। অনুবাদকরাও নানাভাবে এই ধারণা নির্মাণে সাহায্য করেছেন। পশ্চিমের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য মূল রচনার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন, সংযোজন-বিয়োজন করেছেন, কোন অংশকে খুব জোরালোভাবে আবার কোন অংশকে লঘুভাবে উপস্থিত করেছেন, যা তাঁদের পাঠকদের স্বাদের উপযোগী হবে। সমালোচকরাও অনেক সময় আলোচনা করেছেন যে এইসব গল্পগুলির দর্পণে

আসলে আরব সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে।' (আমজাদ হোসেন—আরব্য রজনী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও প্রাচ্যবাদ)

অপরাপর সব ভাষার অনুবাদে আরব্য রজনী যেভাবে আঞ্চলিকতার রঙে রঞ্জিত হয়েছে ইংরেজি অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে তা হয়নি। এখানে মূল্যের প্রতি একটু বেশি রকমের আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে। এমনিতে মনে হতে পারে, এই আনুগত্য প্রদর্শন ইতিবাচক মনোভাব প্রসূত, কিন্তু কার্যত তা নয়। পরিবর্তিত জীবনবোধের আলোয় ইউরোপীয়রা যখন রীতিমতো ভাস্বর তখনো প্রাচ্যের মানুষ কতটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে তা প্রতিপন্ন করার জন্যই এসব করা হয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে; এমনটাই মনে করেছেন বিভিন্ন প্রাজ্ঞজন। তাঁদের এমন ভাবনার গ্রহণযোগ্যতা এইখানে যে, ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিজম ভাবনার মূল সুরই তাই। উল্লেখ্য, ইংরেজ লেখকরা তাঁদের দেশের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের জন্য আরব্য কাহিনি সহযোগে যেসব উপচার প্রস্তুত করেছেন সেখানে ওরিয়েনটালিস্ট ভাবনার কোনোরকম ছায়াপাত নেই। এখানে সবটাই করা হয়েছে শিশু মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে। সেই অনুসারে আরব্য কাহিনির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে দেশীয় ঐতিহ্যের মিশেল দিয়ে রচনা করা হয়েছে এর কলেবর। ভাল বা খারাপ যে দিক থেকে দেখা হোক না কেন, আরব্য রজনীকে ঘিরে ইংরেজদের এই যে অবস্থান তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ এসবের সাপেক্ষে আরব্য রজনীকে যে এভাবে পাঠ করা চলে; এরও যে এমন সব ব্যাখ্যা হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।

যাঁরা সাহিত্যিক, যাঁরা নিয়মিত গল্প উপন্যাসের চর্চা করেন তাঁদের জন্য আরব্য রজনীতে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এর কাহিনি বিস্তৃত এবং যথেষ্ট জটিল। এমন বিস্তৃত ও জটিল কাহিনিও কী অসামান্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পড়তে পড়তে মোটেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয় না। নাটকীয় সব কাহিনি পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে চুম্বকের মতো। এর আকর্ষণ থেকে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখা যায় না কিছুতেই। তাই কেবল পাঠকরা নন দেশ বিদেশের সাহিত্যিক সমাজও প্রভাবিত হয়েছেন আরব্য রজনীর দ্বারা। তাঁদের সৃষ্টির অঙ্গনে লক্ষ করা গেছে এর কমবেশি ছায়াপাত। পেটার এল কারাসিওল নামের জনৈক গবেষক তাঁর The Arabian Nights in English Literature : Literature Studies in the Reception of The Thousand and one Nights into British Culture (Macmillan, 1988) গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জিওফ্রে চসার থেকে শুরু করে জোসেফ করনাড, ডাবলু বি ইয়েটস, টি এস এলিয়ট এর মতো খ্যাতনামা ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মন ও লেখনীতে আরব্য রজনী কী গভীরভাবে ছায়াপাত করেছে। প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যেও এর প্রগাঢ় প্রভাব দুর্লক্ষ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ বিষয়ে অদ্যাবধি তেমন কোনো গবেষণা না হওয়ার জন্য বিষয়টি সেভাবে স্পষ্ট হয়নি।

একটু ধ্যানস্থ হয়ে দেখলে প্রতিপন্ন হয়, আরব্য রজনীতে এই যে জমাটবদ্ধ গল্পরস তার মূলে রয়েছে যেমন গল্পগুলির গল্পকথা তেমনি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এর কথনশৈলী। একটা গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পসমূহ অত্যন্ত জৈবিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত। কোনোটিকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। কখনো মূল কথক গল্প পরিবেশন করেছে, কখনো বা গল্পের চরিত্ররা নিজেরা নিজেদের কথা বলেছে। এতে করে বেশ একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে; দুঃচ্ছেদ্য জালের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে সম্পূর্ণ কাহিনিক্রম। গল্প কথনের সময়কাল রাত্রিকাল। নৈশাহার সম্পন্ন করে শাহরাজাদ রাজার উপস্থিতিতে নিয়মিতভাবে গল্প পরিবেশন করেছে। রাজাকে গল্প শোনাতে শোনাতে প্রায়শ রাত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু গল্প শেষ হয়নি। এমন অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয়েছে পরবর্তী রজনীর জন্য। এক একটা গল্পের সীমা সম্প্রসারিত হয়েছে বহু দূর পর্যন্ত। এতে পরিবেশনকালীন রাত্রির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনো কখনো এমনও হয়েছে, গল্প শেষ হয়ে গেছে কিন্তু রাত শেষ হয়নি। কথককে সেক্ষেত্রে নতুন গল্প শুরু করতে হয়েছে। আটশো ছাব্বিশতম রজনীর কথা যেমন—"এই কাহিনি এখানেই শেষ। কিন্তু রাত তখনও শেষ হয়নি। শাহারজাদ তাই নতুন কাহিনী আরম্ভ করে।" সে যাই হোক, রাত শেষে গল্প শেষ না হোক বা গল্প শেষে রাত শেষ না হোক, কোনো কিছুতেই কোনো সমস্যা হয়নি। গল্পস্রোত প্রবাহিত হয়েছে অনাবিল ও স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। প্রথম রজনীতে উপস্থাপিত গল্পের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। দীর্ঘ এই গল্পস্রোতকে বহমান রাখার জন্য কথনভঙ্গিতে আনা হয়েছে নানা বৈচিত্র্য—'শাহারাজাদ বলতে থাকে, শাহারাজাদ আবার গল্প শুরু করে, শাহারাজাদ আবার গল্প শুরু করে বললো, রাত্রিবেলা আবার সেই কাহিনির শুরু, কালান্দর বলতে থাকে তার কাহিনী ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে সূত্রপাত হয়েছে এক এক রজনীর গল্পের। আরব্য রজনীর আশ্রিত গল্পগুলি এমনিতে গদ্যাত্মক। তবে গদ্যভাষার শরীরে একদিকে যেমন পদ্যের মিশেল দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে তেমনি গদ্যকাহিনিকে অলংকৃত করা হয়েছে পদ্যের ভূষণে—'বৃদ্ধ আমি এই কথাটা,/এই তো প্রথম শুনি।/সত্য কথা, যুবক আমি/নই যে সেটা জানি/হয়তো তুমি চাইবে এখন/নবীন কোন যুবা,/যে তোমায় বাসবে ভালো,/করবে পদসেবা/আমার মতো যোদ্ধা যদি,/আসে তোমার দ্বারে/মান্য তাকে দিতে হবে/সুদে আসল করে।/বিছাক্ষ্ন নাটাই সার কথা নয়,/যেন আমার প্রিয়া,/তুমি যখন বৃদ্ধ হবে/জ্বলবে তোমার হিয়া।' এসব পদ্যের কোনো কোনোটি যেমন নীতিকথা মূলক, এক একটি তেমনি রীতিমতো ব্যঙ্গাত্মক। শায়ের আরবীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। আরব্য কাহিনির স্থানে স্থানে খোদিত রয়েছে এইসব শায়ের—'কোনো একদিন এই প্রাসাদ/রঙে রসে ঝলমল করতো/সব মুছে গেছে কালের করালে/বেঁচে আছে শুধু স্মৃতি।'

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা। কেমন করে আরব্য রজনীর সূত্রপাত হয়েছিল

তা আমরা জেনেছি। আরও জানতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক এর শেষ বা সমাপ্তি ঘটেছে কীভাবে। এই সমাপ্তির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হবে, আরব্য-আখ্যানের সূচনায় যতটা চমৎকারিত্ব আছে সমাপ্তিতে ততটা নেই। উত্তাল স্রোত স্তিমিত হয়ে যেমন কখনো কখনো প্রশান্ত নীরবতায় মুখরিত হয় সমুদ্রবক্ষ এখানেও তেমনি হয়েছে। সহস্র একতম রজনীর কাহিনির শেষ হয়েছে তার নিজস্ব ছন্দে—'সুলতান নানা দেশে চর পাঠালেন। তারা দুনিয়ার কোণায় কোণায় তল্লাসী চালালো, কিন্তু জুহি আর বাদামকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শোনা যায় এই পৃথিবীর অতি নির্জন এক অঞ্চলে তারা সুখে সংসার করছিল। কিন্তু সুলতান তাদের কোনো খবর পায়নি।' প্রবল নাটকীয় গল্পধারার এ এক পরম স্নিগ্ধ উপসংহার। এখানে বিরুদ্ধশক্তির প্রশ্নাতীত প্রাধান্যের বিপরীতে মানবতার আকাশে পরিস্ফুট হয়েছে নতুন এক নক্ষত্র। এমনি করে অসত্যের ঊর্ধ্বে সত্যের প্রতিষ্ঠা জীবনের ধর্ম; সৃষ্টির সারকথা। জিজ্ঞাসা, আকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ, জিঘাংসা এসবের সম্পূর্ণ নিরসন হয় না কোনো দিনই। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তা ক্রমসঞ্চারিত হয়। এক জনের মধ্যে নিভু নিভু হয়ে আসা জিঘাংসার দ্বীপ অন্য একজনের কামনার সংস্পর্শ পেয়ে পুনরায় প্রবল মাত্রা নেয়; এভাবে চলতেই থাকে। তবে জিঘাংসার স্রোত নিরবচ্ছিন্ন থাকলেও একটা সময়ে এসে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত সাপেক্ষে থামতেই হয়, থামতে হয় কথক বা শ্রোতাকেও। শাহারাজাদও তাই নির্দিষ্ট সময়ে তার গল্প শেষ করে।

গল্প শেষ হয়; গল্প শেষে শ্রোতার মনের আকাশে ঘনীভূত হয় প্রবল উৎকণ্ঠার মেঘ। এবার কী হবে! পূর্বতন শর্ত অনুযায়ী এখন রাজাদেশে শাহরাজাদের মৃত্যুদণ্ড বলবৎ হওয়ার কথা। কিন্তু না, এই অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় না শেষাবধি। ততদিনে রাজা শারিয়ার তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। মেয়েদের প্রতি এখন আর সেই প্রবল প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত নয় সে। বিপরীত ঘূর্ণবাতে সে আগুন নিভে গেছে অনেক দিন আগেই। শাহরাজাদ তাকে শুধু রাতের পর রাত গল্প শোনায়নি, পান করিয়েছে তার অসামান্য দেহসুধাও। এ সুধা এতটাই মধুর যে তার অভিঘাতে দুই দুই বার বাবা হয়েছে শারিয়ার। এর মধ্যে একবার যমজ সন্তানের পিতা হয় সে, বলেও কথিত আছে। তার সন্তানরা ততদিনে বেশ বড়ো হয়ে গেছে। গল্প শেষ হলে এই সন্তানদের রাজার কাছে হাজির করে শাহরাজাদের ছোটো বোন দুনিয়াজাদ; সে বলে—'জাঁহাপানা আপনার এই ফুলের মতন তিনটি শিশুর দিকে চেয়ে দেখুন। এদের মাতৃহারা করবার সাধ্য কি আপনার আছে?' তার জিজ্ঞাসার উত্তরে শাহরিয়ার বলে—'শুধু এই শিশুদের জন্য নয়। তোমার দিদির আচরণে মুগ্ধ হয়ে আমার আগেকার বাসনা এবং উন্মাদ সিদ্ধান্ত আমি অনেক আগেই ত্যাগ করেছি।'

পরিবর্তিত মানসিকতার পতাকাবাহী সুলতান শাহরিয়ার অতঃপর শাহরাজাদের পিতা বা তার উজিরকে ডেকে বলে—'শাহরাজাদ যে তোমার কন্যা, একথা আমার

কাছে গোপন ছিল না। সে এক মহীয়সী নারী। আমার অন্তরের সকল পাশবিকতা, নারী-বিদ্বেষ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার বিভীষিকার রাতগুলো সে স্বর্গীয় করে তুলেছিল।' অতঃপর রাজা সিদ্ধান্ত নেয়, এভাবে তার জীবনে নতুন করে আনন্দের ফুল ফোটানোর জন্য শাহরাজাদকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। তার এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রাসাদে তুমুল উৎসব অনুষ্ঠানের বাতাবরণ তৈরি করা হয়; সভাকবিরা রাজাদেশে শাহরাজাদ কথিত কাহিনিগুলো একে একে সংকলন করে; প্রণীত হয় আরব্য রজনীর লিখিত রূপ।

এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরব্য রজনী-র এই কাহিনি নানাবিধ সত্যের দ্যোতক। নারীর বিশ্বাসহীনতা ও তার বিপরীতে পুরুষের বীভৎস পাশবিকতা, এসবের সাপেক্ষে শেষাবধি নীতি নৈতিকতার যে জয়পতাকা এখানে ওড়ানো হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। এমন নৈতিকতার ডানায় ভর করেই চির বহমান রয়েছে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারা। মানুষের, সেইসঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসকে এভাবে বহমান রাখার নেপথ্য প্রেরণা হিসাবে আরব্য রজনী সুলভ আরও যেসব কাহিনি দুনিয়া জুড়ে প্রচলিত আছে তার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আবার এও স্বীকার্য যে, নিছক নীতি নৈতিকতার ধারক বাহক হিসাবে আরব্য রজনী বা এই জাতীয় আখ্যানের মূল্যায়ন করা হলে ভুল হবে। এখানে পরিবেশিত হয়েছে যেসব গল্প নীতি নৈতিকতা নিরপেক্ষ রূপেও তার একটা মূল্য আছে। গল্পরস এখানে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জৈব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শৈল্পিক সত্য। এমনি করে জৈবিক সত্যের ঊর্ধ্বে শিল্প সত্যের প্রতিষ্ঠার অন্য নাম সংস্কৃতির প্রবাহমানতা; যা মানব সভ্যতার মূল চাবিকাঠি। সভ্যতার বহমান ধারাকে এভাবে ভিতর থেকে শক্তি যুগিয়ে পুষ্ট করে বলেই আরব্য রজনী বা এই শ্রেণির রচনার এমন বিপুল জনপ্রিয়তা। সময়ের অভিঘাতে হাজারও বার সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়; এভাবে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মাঝে অনেক ভাঙাগড়া সম্পন্ন হলেও চির অমলিন থাকে আরব্য রজনী সুলভ গল্পকথা; আর এসব গল্পকথার স্পর্শে শিল্প সাহিত্যের অঙ্গন, সেইসঙ্গে মানুষের মনের চরাচর উদ্ভাসিত হয় অপরূপ পবিত্রতায়।

ঋণস্বীকার

রচনা

আরব্য রজনী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও প্রাচ্যবাদ—আমজাদ হোসেন, উদার আকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা

ব্যক্তি

স্বপন বসু, উনিশ শতক গবেষক

মসিহুর রহমান, আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়